Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.73-79
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বনফুলের কলমে (নির্বাচিত ছোটগল্প) বিচিত্র চরিত্র

রানু বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Banaful is a unique genius in the field of contemporary Bengali literature. At the heart of his uniqueness is his fancy character. According to the characters, his stories have different parts - objective, supernatural, satirical, allegorical, the main character, the mystery of the human mind. Rabindranath called him a "storyteller of scientific temperament" for the excellence of his writings. In his writings we often find life thirst and devotion to life. The novelty of his writing is admirable. His basic life consciousness has gradually developed in the hopeful environment of the nineteenth century. Conflict and decay in Calcutta city life, on the other hand, have set the stage for his short stories and in the clash of these two, his sense of life and life thought has developed. He was truly a transitional artist.

Key words: Banaful, life experience, short story, unique character, human appeal, idealism.

মূল আলোচনা (Discussion): বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় হুগলি জেলার শেরাখোলা গ্রামে এক গ্রামীন হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। বলাইচাঁদের পিতা ছিলেন ডাক্তার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা ছিলেন মৃণালিনী দেবী। বনফুলের বসত বাড়ীটি ছিল গ্রামের বাইরে পীর বাবার ও গঙ্গা নদীর নিকটে। গ্রামের বাইরে এক বুনো জায়গায় বসতবাটি ছিল বলে, ছেলেবেলা থেকেই বন ও ফুলের প্রতি তাঁর একটা মমতা ছিল। তিনি জঙ্গলে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন বলে, গাঁয়ের লোক তাঁকে 'জংলী বাবু' বলত। সেইকারণেই পরিণত বয়সে তিনি নিজের ছদ্মনাম রেখেছিলেন বনফুল। বাবা ডাক্তার থাকায় এবং নিকটস্থ গঙ্গা ছিল বলেই তাঁর বাড়িতে সবসময় বিচিত্র লোকের সমাগম হত। ছেলেবেলায় বনফুল এইসকল বিচিত্র মানুষের বিচিত্র স্বভাব দেখেছেন। অন্যদিকে মা মৃণালিনী দেবী হিন্দু নারী হলেও তিনি কোনদিন কুসংস্কারে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। বনফুলের আত্মজীবনী (বনফুল – পশ্চাৎপট) থেকে জানা যায়, মৃণালিনী দেবী অসুস্থ থাকায় শিশু বনফুল শৈশবে এক মুসলিম নারীর বুকের দুধ পান করেছিলেন। বনফুলের মায়ের ছিল অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি। তিনি একবার কোন কথা শুনে সহজেই মনে রাখতে পারতেন। স্বল্প শিক্ষিতা এই নারী স্বামীর কাছ থেকে প্রতিদিন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ শুনে আয়ত্ত করেছিলেন। মায়ের এই শাণিত উজ্জ্বলতা ও বাবার ঔদার্যময় ব্যবহার বনফুলের ব্যক্তিত্বকে নির্মাণ করেছিল।

বনফুল পূর্ণিয়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাহেবগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। তারপর ১৯১৮ সালে মেট্রিকুলেশন পাশ করে হাজারীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে আইএসসি পড়ার জন্য

ভর্তি হন। সেখানেই তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম কবিতা লেখেন। এই সময় বনফুল বাড়িতে পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি ডিকেন্স, স্কট, থ্যাকারে, শেক্সপিয়ার, মিলটন, টলস্টয়, ওগোর সাহিত্য পাঠ করেন। তাঁকে সাহিত্যরচনায় মূল অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁর কাকা চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর তাঁর ডাক্তার অধ্যাপক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। এছাড়া তাঁর প্রিয় দুই বন্ধু পরিমল গোস্বামী ও সজনীকান্ত দাস ছিল তাঁর সৃষ্ট বিচিত্র চরিত্রের মূল ভান্ডার। হাজারীবাগ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বনফুল ডাক্তারি পড়ার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় তিনি গদ্য রচনা শুরু করলেন... "মেডিকেল কলেজে আমি অনেক সময় খালি ক্লাস রুমে বসে থাকিতাম। প্রকাণ্ড ঘরে নির্জন গ্যালারিতে বসে থাকিতে খুব ভালো লাগিত। নির্জন পরিবেশ না হইলে আমি লিখিতে পারিনা। মেডিকেল কলেজে খালি ক্লাসরুমগুলিতেই সেই নির্জনতা পাইতাম।" সেইসময় থেকেই বনফুল ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন।

বনফুল প্রচুর কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ছোটগল্প'। তিনি জীবনে প্রায় ৫৮৬ টি (বনফুলের রচনাবলী অনুযায়ী) ছোটগল্প লিখেছিলেন। বিহারের মফঃস্বলের গ্রামীণ জীবন থেকে শুরু করে কলকাতার ছুটন্ত জীবন তাঁর লেখার বিষয়বস্তু ছিল। নরনারীর জীবনে প্রেমের বৈচিত্র্য ধারা যেমন তিনি অঙ্কন করেছেন, তেমনি এই পৃথিবীর স্বার্থপরজীবি মানুষের ছবির পাশে উপকারী মানুষের ছবিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখায় সাঁওতাল, ভীল, ভিখিরি, জমিদার, নায়েব, ডাক্তার, মোক্তার, হিন্দু, মুসুলমান চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তিনি সমাজে উপস্থিত হঠাৎ কোন সমস্যাকে আলোচনা করেননি, তিনি বিশ্লেষণ করেছেন মানুষের চিরপরিচিত মানবিক সমস্যাকে, যার কোন সমাধান আজও হয়নি। তাঁর গল্পে নর নারী সহজ, সাবলীল, আমাদের চেনা সমাজ। প্রতিটি ছোটগল্পের চিত্রকল্পে ভরা - পড়লে মনে হয় চোখের সামনে 'সিরিয়াল' চলছে। হঠাৎ করে তিনি গল্প থামিয়ে দেন আর পাঠক বাহ্যজ্ঞানশূণ্য হয়ে যায়। এই বৈশিষ্টয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন, বিজ্ঞানের সাহিত্যিক। বন্ধু পরিমল গোস্বামী বনফুলের প্রসঙ্গে বলেছেনঃ "...তুমি যা দেখেছ, যা শুনেছ,তার যেখানেই চিত্রধর্মীতা আছে তাকেই তুমি বেঁধে ফেলেছ গল্পের চেহারায়। যেন ফটোগ্রাফের প্লেটের উপত তড়িৎগতিতে তার ছাপ পড়ে গেছে। বাক্যের বৃথা ব্যয় নেই, সহজ সরল ছবি"। (পরিমল গোস্বামী, ভূমিকা, বনফুলের গল্প সংগ্রহ, ১৩৭২, ২য় শতক, পৃঃ ৯)।

বনফুল ডাক্তার হওয়াতে বিচিত্রস্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। বিচিত্র মানুষের সাক্ষাতে তার জীবনে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মানুষের মনের গহনে অহংকার কিভাবে মানুষকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে তার চিত্র যেমন তিনি দেখেছিলেন তেমনি অতিশয় নিঃঅহংকারী মানুষের ভক্তি - ভালবাসা তাঁকে আনন্দ দান করেছিল। 'অভিজ্ঞতা' গল্পের প্রেক্ষাপট হল "তখন সরকারি চাকরি করি। একটি বড় শহরে সদর হাসপাতালে ভার লইয়া আছি। সেই সময় শহরে টাইফয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।" আমরা জানি; পরাধীন ভারতবর্ষে টাইফয়েড কলেরা মহামারী রূপ ধারণ করত। গল্পের শুরুতেই দেখি, বনফুল সারাদিন রাত রোগীদের নিয়ে সদা ব্যস্ত কিন্তু তারই মধ্যে রোগীর দুই পিতাকে নিয়ে তিনি বিব্রত বোধ করেন।

এক আত্মঅহংকারী মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বনফুল। ভদ্রলোক পেশায় ডাক্তার, শহরের বাসিন্দা এবং ধনী হওয়াতে লেখককে যারপরনাই অপমান করেছিলেন সর্বদা। নিজ পুত্রের সব রকম চিকিৎসা তিনিই নিজে করতেন, যদিও হাসপাতালে ছেলেকে তিনি ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু বনফুলের ঔষধে তার ভরসা ছিল না। সব ওষুধ একেবারে দেওয়াতে ছেলেটির প্রকৃত চিকিৎসা বিঘ্নিত হয় আর রোগীর মৃত্যু

আসন্ন হয়। যখন ছেলেটিকে আর বাঁচানো সম্ভব না ভদ্রলোক সেদিন ছেলের চিকিৎসার জন্য বনফুলের কাছে হাতজোড় করেছিলেন, কিন্তু বনফুল রোগী দেখেই বুঝেছিলেন, এই ছেলে পরদিন ভোর দেখতে পারবে না। লেখক নিজের অক্ষমতার কথা জানালে ভদ্রলোক প্রচন্ড রেগে যান এবং ছেলেটিকে কংগো রেড (CONGO RED) ঔষধ দিতে চান। লেখক এই ব্যপারে নিস্তব্ধ থাকলে ভদ্রলোক ওষুধের জন্য অন্যত্র গমন করেন এবং মৃত্যুকালে ছেলেটির সঙ্গে বাবার দেখা হয়নি। পরদিন সকালে কাউকে কিছু না বলে আত্মদম্ভিত ভদ্রলোক অন্যত্র গমন করেন।

বনফুল কিন্তু দ্বিতীয় ছেলেটিকেও বাঁচাতে পারেননি। অতিশয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছেলে যখন খুব অসুস্থ, লেখক তাকে একবার মাত্র দেখতে যান। ছেলেটির মৃত্যুকালে তার পিতা-মাতার ব্যবহার দেখে লেখক বিস্মিতবোধ করেন। ছেলে মৃত্যু পথযাত্রী জেনেও পিতা গীতার পঞ্চম শ্লোক পাঠ করছিলেন আর ছেলেটির মা নীরবে চোখের জল ফেলছিলেন। বনফুল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। ছেলেটির বাবা অনুনয় সুরে লেখককে বললেন, "ইতস্ততঃ করছেন কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পদধূলি তো দরকার এ সময়ে। নিন...জুতো খুলুন....দিন বেশ ভাল করে মাখিয়ে দিন ওর সমস্ত মাথায়...আসুন—' । বনফুল বিমূঢ় হয়ে যান। কোন এক অলৌকিক শক্তি তার ওপর ভর করে। তিনি বৃদ্ধের কথা অমান্য করতে পারলেন না, জুতোর ফিতে খুলে খুলতে শুরু করলেন। আমরা জানি, মৃত্যু অমোঘ, চিরস্থায়ী। তাকে অগ্রাহ্য করার কোন শক্তি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কারুর নেই; বনফুলেরও ছিল না। তবুও তিনি ডাক্তার, তিনি রোগের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধরত সৈনিক। কিন্তু মানুষের সরল বিশ্বাসের কাছে বনফুল হেরে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ছেলের মৃত্যুর পর ভদ্রলোক হাসপাতালকে এক হাজার টাকার চেক দিয়েছিলেন। গল্পের শেষে লেখক বৃদ্ধ লোকের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে আমাদের চমকে দেন "চেকটা ভাঙাইতে গিয়া আবিষ্কার করিলাম যে, তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন।" অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা সকলসময় মানবধর্ম বহন করে, শিক্ষা কখনো আত্ম অহংকারী হয় না।

মানুষের স্বপ্নে ও বাস্তবে, আশা আর প্রাপ্তির মধ্যে বরাবর দূরত্ব থেকে যায়। তবুও মানুষ হাল ছাড়ে না অপরাজয় শক্তিতে সকল বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। তাঁদের জেদি মানসিকতা জীবনের পাথেয় হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে সেই সকল চরিত্র, অনেকসময় সমাজের হাসির পাত্র হয় আবার কখনো তারা আত্মীয়- পরিজনহীন হয়ে যায়। বনফুলের অর্জুন মন্ডল সেইরকম এক চরিত্র। তিনি প্রথম জীবনের সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, তিনিই পরে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেছিলেন। সম্পূর্ণ গৃহস্থ সাতটি মেয়ের পিতা এই অর্জুন মন্ডল বাজারে মাছ বিক্রি করতেন প্রথম জীবনে। নিজের প্রচেষ্টা - সম্পূর্ণ অধ্যাবসায় মানুষ কিভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে তারই প্রতীক এই অর্জুন মন্ডল।

আমরা জানি, বনফুলের পিতা সত্যচরণ বাবুও ডাক্তার ছিলেন। বনফুল সেই প্রেক্ষাপট দিয়ে "অর্জুন মণ্ডল" গল্প শুরু করেছেন। লেখকের বাবাকে গ্রামের জমিদার তথা প্রশাসন সকলেই সম্মান করতেন। একদিন এই অর্জুন মন্ডলকে জমিদারের রোষ থেকে বনফুলের পিতা বাঁচিয়েছিলেন। সেদিন অর্জুন মন্ডল বিস্ময়দৃষ্টিতে অসহনীয় পরিবেশকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন "উঃ; বিদ্যার কি প্রতাপ! কি হবে পয়সায়, কি হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস।" এরপর তিনি মনস্থির করলেন, পড়াশোনা শুরু করবেন; তাঁর এই উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করলেন লেখকের পিতা। অর্জুন মণ্ডল নিজের প্রচেষ্টায় পড়াশোনার পরিবেশ

তৈরি করেছিলেন - তখন "টেবিল চেয়ার ছিল না, উবু হয়ে বসতেন। একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, তার ওপর খবরে কাগজপাতা। তাতেই একটি ছোট ইঁটের উপর তিনি প্রদীপ রাখতেন। সেই কেরোসিন কাঠের বাক্সটির একাধারে ছিল তঁর টেবিল এবং শেলফ। নিচের ফাঁকটায় তাঁর বই, খাতা, দোয়াত থাকত।"

আপন প্রতিভায় অর্জুন মণ্ডল পরবর্তীকালে এক সাহেবের (তখন দেশ পরাধীন ছিল) সুদৃষ্টিতে পড়েন এবং সাহেবের সুপারিশেই তিনি কম্পাউন্ডারি শেখেন। সেখানে স্কলারশিপ পেয়ে হাসপাতালে ড্রেসারের কাজে নিয়োগ হন। ক্রমশ সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয় এবং অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসেবে হাসপাতাল থেকে সিভিল সার্জন এর বেতন পেতে শুরু করেন। অর্জুন মন্ডল এতদূর এগিয়ে থেকোও নিজের কর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাই তিনি এরপর প্রাইভেটে ডাক্তারি করতে শুরু করলেন। কয়েক বছর বহুলোকের চিকিৎসা করেন।

কর্মজীবনে এত প্রাপ্তি পেয়েও ব্যক্তিগত জীবনে মানুষটি একেবারে একা ছিলেন। তাঁর সাত মেয়ে ও সাত জামাই ছিল নিরক্ষর। অনেক আশা নিয়ে একমাত্র নাতি চিত্তরঞ্জনকে কলকাতার 'মিত্র ইনস্টিটিউশনে' ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু অসংখ্য কুসঙ্গে প্রভাবে ছেলেটির শিক্ষা খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি সারা জীবন নিজেকে সৎ রাখার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও সমাজ ও পরিবারের বিপক্ষে তাকে অনেক সময় যেতে হয়েছিল, ফলে মানুষটি আরোও একাকি, নিঃসঙ্গ হয়ে পরে। সৎ -পরোপকারী - নির্ভীক এই মানুষটি কোনদিনই কোন ইচ্ছেই পূরণ হয়নি। একবার বনফুল ডাক্তারি পড়ার জন্য বিলেতে যাবার মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু পয়সার অভাবে তা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন অর্জুন মন্ডল তাঁর জমানো টাকা লেখকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। যদিও লেখক সেই টাকা গ্রহণ না করে জাহাজের চাকরি নিয়ে বিলেতে চলে যান এবং সেখান থেকে ডাক্তারি পাশ করে দেশে ফিরে আসেন।

শেষ জীবনে অর্জুন মন্ডল তীর্থে যাবার আগে একবার লেখকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তিনি নিজের জন্য একটা সিন্দুক বানানোর কথা ভাবেন। এই জড়বস্তুটির প্রতি তাঁর অত্যাধিক মমতা তৈরি হল, লেখকের বর্ণনায় তা হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে – "জলের মত পয়সাও খরচ হতে লাগল। পিতলের বড় বড় ডুমো ডুমো পেরেক কিনে আনলেন সিন্দুকের শোভাবৃদ্ধির জন্য। কোণে কোণে লোহার পাত দিলেন মজবুত করবার জন্য। মিল্টন কাপড় কিনে সিন্দুকের ভিতরে অস্তর দিলেন। যত খরচই হাক, জিনিষটা মনোমত করতে হয়। জীবনে কোন জিনিসই মনো মত হয়নি; এটাকে নিখুঁত করতেই হবে --- আমার মনে হল এই ধরনের একটা জেদ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। অন্তত একটা কাজেও তিনি যে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন, এই সান্ত্বনাটুকু আঁকড়ে তিনি তীর্থবাস করতে চান। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত আগ্রহ যেন সিন্দুকটার উপর প্রয়োগ করেছেন তাই।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সিন্দুকটি ট্রেনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারল না। ফলে অর্জুন মন্ডলের শেষ ইচ্ছে আবার অপূর্ণ থাকলো। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম যেন তাঁর জীবনকে বারংবার খণ্ডিত করেছে।

আমাদের সমাজে যেমন স্বার্থপর লোকও আছে তেমনি কিছু পরোপকার লোকও আছে। এঁরা আমাদের সমাজের নিয়মের একদম বাইরের মানুষ। বনফুল তাঁর 'চম্পা মিশির' ও 'আলোবাবু' ছোটগল্পে এরকম দুই চরিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। বিহারে ডাক্তারির সময় চিকিৎসক বনফুলের কাছে সকল শ্রেণীর মানুষের আনাগোনা হতো। এরই মধ্যে একদিন বনফুলের সাথে এক বিহারি ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়। চম্পা মিশির একদিন টমটম থেকে পড়ে যান এবং তিনি ওষুধ নিতে আসেন লেখকের কাছে। এই

বিহারী বাবুটির কথায় লেখক কিছু চমক পেলেন আর কয়েকদিনের মধ্যেই চম্পা মিশির বনফুলের ভালো বন্ধু হয়ে যান।

এই কয়েকদিনের মধ্যেই লেখক, চম্পা মিশির সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনে ফেলেন। এঁর কিছু অদ্ভুত শখ ছিল --- তিনি প্রতিদিন টাট্টু ঘোড়ার সওয়ারের সময় সবচেয়ে বাজে ঘোড়াকে (WRONG HORSE) ভাড়া করতেন বেশি টাকা দিয়ে আর যতদিন সেই ঘোড়া ঠিক না হচ্ছে সেই টমটমকে তিনি তার নিজের কাছে বাহান দিয়ে রাখতেন। মানুষকে সাহায্য করা তাঁর আরেকটি কাজ ছিল। তিনি বেশিরভাগ সময় অফিস আদালতে যেতেন আর সেখানে মোকদ্দমায় যে প্রার্থী গরীব থাকত, সে যদি সৎ হত, মিশিরজি তার পক্ষ হয়ে লড়তেন; দরকার হলে নিজের টাকা দিয়ে তিনি উকিল নিয়োগ করে সেই মকদ্দমায় জিতিয়ে দিতেন গরীব মানুষটিকে।

দীর্ঘদিন আদালতে ঘোরাফেরার ফলে তিনি আইনি বুদ্ধি কিছু শিখেছিলেন। তাই নতুন কোন উকিল যদি কোর্টে কেস না জিততে পারতেন, তিনি তাঁদেরকে পরামর্শ দিতেন। পরবর্তীকালে কিছু নাম-জাদা উকিল তাঁর এই ঋণের কথা স্বীকার করেছেন এবং কেউ তাকে অর্থ দান করতে চাইলে, তিনি মাথা নাড়িয়ে জিভ কেটে বলতেন "আরে রাম রাম ওকিল সাহেব, আমি ব্রাহ্মণ, বেনিয়া নই। এ আমার পেশা নয়, খেলা।" এই বেহারীবাবু অন্য উপায়ে বনফুলকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিলেন। লেখক বিলেতফেরত হলেও প্রথমজীবনে (বনফুল) ডাক্তারির পসার সেইরকম জমেনি। এই মিশিরজি লেখককেও অনেক রোগী পাঠিয়েছিলেন।

এই সদাশয় মানুষটি মৃত্যুর সময় বনফুলকে তার শেষ অনুরোধ করেন, গ্রামে রমজান নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি ভেড়াকে খেলায় লড়িয়ে রোজগার করতেন। কিন্তু ভেড়াটা অসুস্থ হওয়ায় রমজান খুব বিপদে পড়ে যান। সৎ মানুষ ছিলেন এই রমজান। তিনি মিশিরজির কাছ থেকে কোন অর্থ সাহায্য নেন নি। তাই মিশিরজি বনফুলকে অনুরোধ করেছিলেন, রমজানের ভেড়াকে চিকিৎসার জন্য। বনফুলের ঔষধে ভেড়ার চিকিৎসা হয় এবং আবার সে সকল খেলায় জিতে যায়। এই ভেড়াটি সকল খেলায় জিততে থাকলে সকলে বনফুলের চিকিৎসার প্রশংসা করেন। যদিও লেখক নিজে জানতেন, এই প্রশংসা আসলে চম্পা মিশিরজির প্রাপ্য, বনফুল তো শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

বনফুলের আরেক বৈচিত্র্য চরিত্র হল আলোবাবু, যদিও সমাজের লোকেরা তাঁকে খেপাবার জন্য 'আলুবাবু' বলত। একদিন একটি পাখির ছানা নিয়ে আলোবাবু লেখকের কাছে আসেন, চিকিৎসার প্রয়োজনে। এই প্রথম কোন মানুষ নিজে রোগী না হয়ে পাখির চিকিৎসার জন্য এসেছে দেখে লেখকের খুব ভালো লাগল। ছানাটির পায়ে চোট পেয়েছিল, বনফুলের চিকিৎসায় পাখিটি সুস্থ হয়ে ওঠে। আলোবাবুর সাথে আলাপের পর লেখক জানতে পারেন, ভদ্রলোক খুবই নরম প্রকৃতির, অন্যের কষ্ট তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। উনি স্থানীয় অবিনাশবাবুর বাড়িতে আশ্রিত। আরেকদিন, লেখক আলোবাবুকে দেখেন অবিনাশবাবুর বাড়িতে, সেখানে তিনি একটি কুকুরছানাকে নিয়ে সদা ব্যস্ত। বনফুলের বিস্মিতনেত্র দেখে অবিনাশবাবু বলেন, আলোবাবু "বড়ো স্নেহের কাঙাল... সেবা করতে বড়ো ভালোবাসেন।"

লেখক আলোবাবুর জন্য একটা কাজ খুঁজে দিলেন হাসপাতালে, কিন্তু এই নিরপরাধী মানুষটিকে একটা মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ কাজ থেকে ছাঁটাই করেন। অন্যদিকে অনুকুলবাবুর স্ত্রীও আলোবাবুকে তাড়িয়ে দেন। তখন লেখক নিজের বাড়িতে তাঁকে আশ্রয় দিলেন। ভদ্রলোক সারাদিন পশু-

পাখি-মানুষ সকলের সেবা করে চলত, কোণ কাজে ক্লান্তি ছিল না, মাঝে মাঝে নিজের টুপি বাজিয়ে গান করত। একদিন লেখক আলোবাবুর শখ দেখে চমকে যান। প্রতিদিন সকাল দশটায় তিনি নিয়মিত ঘড়িতে দম দিতেন। কোনদিন এর অন্যথা হত না, আলোবাবুর এই সম্পর্কে বক্তব্য ছিল "আমাদের যেমন খাবার, ঘড়ির তেমনি দম"। ঘড়িটিকে তিনি খুব সযত্নে রাখতেন, পরম মমতায় চোখ বুজে দম দিতেন, দেখে মনে হত 'যেন পুজো করছে'। একবার আলোবাবু লেখককে বলেছিলেন "জীবন্ত কোন জিনিস পোষবার সামর্থ্য নেই আমার। ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু পয়সা নেই। সেই জন্য বিয়েও করিনি"। এই ঘড়িটির প্রতি তাঁর এক বাৎসল্য স্নেহ গড়ে উঠেছিল। একদিন ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে লেখক দেখলেন, আলোবাবু খুব জোরে গান গাইছেন "আমায় ওরা সইলো না কেউ/ আমার কাছে কেউ রইলো না কেউ-" লেখক কোনদিন তাঁকে এইরকম আচরণ করতে দেখেননি। আলোবাবু পরে তাঁর দুখের কথা বলেন "আমার ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। ঠিক সময়ে হয়তো ভালো করে দম দিতে পারবে না - টপ টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।" কিছুদিন আলোবাবুর কোন খোঁজ ছিল না, কয়েকদিন পরে লেখক জানতে পারেন, তিনি পাগলাগারদে আছেন। লেখক বুঝতে পারলেন, আমাদের সমাজ আলোবাবুর মত সৎ, পরোপকারীর জন্য নয়, তাই আলোবাবু আমাদের এই ভদ্র সমাজ থেকে নিজেই বিদায় নিয়েছেন।

'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পটি বাংলা কথাসাহিত্যে এক অনন্য সম্পদ। এই গল্প লেখার সময় লেখক বিপরীতধর্মী দুই চরিত্রকে প্রেক্ষাপট করেছেন। বাঙালির বাকসর্বস্বতা, অপদার্থতা, আরম্ভপ্রিয়তা, ধোঁকাবাজির রূপটি তিনি এই গল্পে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে যিনি স্বদেশে তথাকথিত অভদ্র জনকে মনুষ্য পদবাচ্য বলে বিবেচনা করে না, তাদের সুখ-দুঃখে কোথাও বিচলিত হন না, সেইসব নীচ ব্যক্তির অন্তরের দৈন্যতাকে তিনি এই গল্পে স্পষ্ট করেছেন। প্রকৃত ভদ্র আচরণ ও নৈতিক স্বাধীনতা কিভাবে একটি লোককে যথার্থ মানুষের পদবাচ্য করে তোলে, এই গল্পে সেটাই কেন্দ্রীয় বিষয়।

সামন্ত একজন সাধারন ব্যক্তি, তাঁর বর্ণনায় লেখক লিখেছেন, "পরনে একটি ময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধুলি ধুসরিত একজোড়া দেশি মুচির তৈরির চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাঁচ চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলে এবং তার ডান দিকের ডান্ডাটা নেই, সেদিকে সুতো দিয়ে বাঁধা"-- এই নিপাট মানুষটি হাতে থেলো হুক্কা নিয়ে স্টেশনের গাড়িতে যখন চারটি শ্রেণীতে বসার সিট পেলেন না, তখন অনেক টাকা খরচা করে প্রথম শ্রেণীতে টিকিট কেটে উঠলেন। কারণ পরদিন সকালেই তার গদিতে অনেক বড় কাজ আছে। ঘটনাচক্রে তাঁর সহযাত্রীটি হলেন প্রথম শ্রেণীর মানুষ, যিনি সারাক্ষণ মুখে ধুমায়মান পাইপ নিয়ে ইংরেজিতে কথা বলছিলেন।

ট্রেন চলা শুরু হতেই টিকিট চেকারের কাছে সামন্ত মশাই যখন তার টিকিট ভাড়া দিয়া দিয়ে পুনরায় কোটি বদ্ধ করে ঘুমোতে গেলেন তখন বাঙালি সাহেবের কাছ থেকে টিকিট চেকার সিনেমার সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। ফলে টিকিট চেকারের সাথে বাঙালি সাহেবের প্রথমে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে ও পরে হিন্দিতে কথোপকথনে ঝগড়া বেঁধে যায়। প্রথমে সামন্তবাবু বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে ঈশ্বরের নাম জপ করতে শুরু করলেন। কিন্তু যখন চেকার (ক্রু) বাঙালি জাতি নিয়ে কটু কথা বললেন, সামন্ত মহাশয় অতি তৎপরতায় বাঙালি সাহেবের টিকিটের দামটা নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিলেন। এতক্ষণ বচসায় সামন্ত বাবু বিরক্তবোধ করেলেও, তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু বাঙালি জাতিকে নিয়ে বাজে কথা শোনার পর তার মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হল। তিনি তখন বাঙালি সাহেবকে ঠিকানা দিয়ে বললেন, তার গদিতে যেন

তিনি টাকাটা সুবিধামতো দিয়ে আসেন। তারপর ক্রুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কটা বাঙালি আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দেশের ভদ্রতা রে বাপু!"

গল্পটি পড়ে প্রথমে পাঠক বিমূঢ় হলেও পরে উৎকট হাসিতে ফেটে পড়বেই। প্রাদেশিক সৌভ্রাতৃত্বের মানদণ্ডে আমরা যদি বাঙালি সাহেবকে বিচার করি, দেখব ঠিক বিপরীতে সামন্ত মশাই দাঁড়িয়ে আছেন। জাতি-পরিচয়-সংস্কৃতি মুছে দিয়ে সাহেব যখন তার সাহেরি পোশাক ও চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজি কথা বলেছেন তখন সামন্ত মশাই স্বদেশী ভাষা বলতে কার্পণ্যবোধ করেননি। এখানেই গল্পটি আকর্ষণীয় হয়েছে। শ্রীপতি সামন্তের দীপ্তির ঝলকানিতে পাঠক কিন্তু তৃপ্তি লাভ করেছে।

ছোটগল্পে বনফুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি গল্পের রূপ-দৃষ্টিতে। গল্প আকারে কত ছোট ও হালকা হয়ে জীবনের কত বৃহৎ ও গভীর সত্যকে প্রকাশ করতে পারে তার প্রমাণ তাঁর গল্পগুলি। 'কত কম বলে বেশি বলা যায়' - এটাই তাঁর গল্পের সূত্র। আবেগবাহুল্য বর্জিত ঋজু মেরুদণ্ডের একজন সুস্থ বলিষ্ঠ রূপ তাঁর পুরুষ চরিত্রে সর্বদা বিদ্যমান ছিল। আমার নির্বাচিত এই পাঁচটি গল্পে তিনি সেইসকল চরিত্রকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

বনফুলের ছোটগল্পে গদ্যশৈলী অনলংকৃত অথচ সুন্দর, সরল অথচ বলিষ্ট, মনোরঞ্জন অথচ ক্ষুরধার। তিনি তাঁর ছোটগল্পে মধুর রসের প্রয়োগ করতেন না, বক্রোক্তি-শ্লেষ দিয়ে পাঠককুলকে বোঝাতেন আমাদের সমাজের ক্ষুরধার দিকটি। সংকেতময় সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যে তিনি আমাদের অপ্রত্যাশিত অথচ অনিবার্যভাবে ভাবসত্যের প্রকাশ করতেন। বনফুল কখনো জীবনকে বিচ্ছিন্ন কোন খণ্ডতার মধ্যে দেখেননি, জীবনের সামগ্রিক চরিত্র অন্বেষণ ছিল তাঁর শিল্প সৃষ্টির মুখ্য প্রেরণা। তাই অনন্ত জীবন প্রবাহে রহস্য সন্ধানে কেবল মানুষের প্রেমের বিকৃতি বা অনিয়ন্ত্রিত passion ই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকেনি, জীবনের পূর্ণ পরিকাঠামোয় তিনি প্রেমের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী (Reference):

১) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, 'উপন্যাসের নবরূপায়ণ', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা-৭৩, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৬৮৩ - ৭০৭।

২) রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যাকালীন বাংলা সাহিত্য, 'পরীক্ষাপ্রবণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিঃ বনফুল', দে'জ পাবলিশিং, শ্রাবণ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৪০৮।

৩) মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার, 'কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছরঃ ১৯২৩-১৯৯৭', দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

৪) নন্দী ডঃ ঊর্মি, বনফুলঃ জীবন, মন ও সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, বইমেলা, ১৯৯৭।

৫) বেরা অবনীন্দ্রনাথ (প্রকাশক), বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা- ৯, জৈষ্ঠ্য, ১৩৫৫।